করেছিল। তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের গ্রন্থ অবলম্বনে স্মিথ মনে করেন যে, বিন্দুসার ১৬টি রাজ্যের বিলুপ্তিসাধন করে বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যই দক্ষিণ-ভারত বিজয় সম্পন্ন করেছিলেন। হরিসেন কর্তৃক রচিত 'বৃহৎকথা-কোষ', রত্নানন্দ কর্তৃক রচিত 'ভদ্রবাহু-চরিত' ও 'জৈন' গ্রন্থাদিতে দক্ষিণ-ভারতে চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের রাজ্যজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বিন্দুসার কর্তৃক দক্ষিণ-ভারত জয় সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজ্যবিস্তারের মত উপযুক্ত ক্ষমতা বিন্দুসারের ছিল না। রাজ্যজয় করা অপেক্ষা দর্শনশাস্ত্রেই বিন্দুসার অধিক আনন্দলাভ করতেন।

আধুনিক মত

রাজত্বের শেষের দিকে চন্দ্রগুপ্তকে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি ও সিরিয়ার অধীশ্বর সেলিউকসের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। ভারতে গ্রীকবিজিত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের আশায় সেলিউকস সসৈন্যে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে সিন্ধু অঞ্চলে এসে উপস্থিত হন। চন্দ্রগুপ্ত সসৈন্যে সেলিউকসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না এবং যুদ্ধ আদৌ হয়েছিল কিনা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। গ্রীক-ঐতিহাসিক স্ট্রাবো শুধু সন্ধির কথাই উল্লেখ করেছেন এবং তা চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভেরই ইঙ্গিত দেয়। সন্ধির শর্তানুসারে সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, কান্দাহার, হীরাট ও বেলুচিস্তান প্রদান করেন এবং উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বিনিময়ে চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকসকে পাঁচশত হাতি উপহার প্রদান করেন। এর পর সেলিউকস মেগাস্থিনিস নামক একজন রাষ্ট্রদূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রেরণ করেন। এই সন্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে স্মিথ বলেন যে, দু'হাজার বছরের অধিক পূর্বে প্রথম ভারতীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তের অধিকার লাভ করেন—যা পরবর্তী কালে এতটা সাফল্য মোগল সম্রাটরা বা ইংরাজরা সমগ্রভাবে লাভ করতে পারেন নি।*

সেলিউকসের সঙ্গে যুদ্ধ

সেলিউকসের সঙ্গে সন্ধি

সন্ধির গুরুত্ব

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঃ ডক্টর আর. কে. মুখার্জীর মতানুসারে "চন্দ্রগুপ্ত নিঃসন্দেহে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।" প্লুটার্ক-এর মতে চন্দ্রগুপ্ত ৬,০০,০০০ সৈন্য নিয়ে সমগ্র ভারত জয় করেছিলেন। মোটমুটিভাবে বলতে গেলে আফগানিস্তান ও দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। (১) নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করে সমগ্র মগধরাজ্য তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। (২) গ্রীকদের বিতাড়িত করে তিনি পাঞ্জাব সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। (৩) সেলিউকসের কাছ থেকে তিনি কান্দাহার, কাবুল, হিরাট ও বেলুচিস্তান লাভ করেছিলেন। রুদ্রদমনের 'জুনাগড়-শিলালিপি' অনুসারে পশ্চিম-ভারতে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। (৫) তামিল কবি মামুলনার রচিত গ্রন্থে জানা যায় দক্ষিণ-ভারতে তিনেভেলি জেলা তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। মহীশূরে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে উত্তর-মহীশূর তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। এক কথায়, পূর্বে বঙ্গদেশ থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও হিন্দুকুশ পর্বত এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে তিনেভেলি পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত

দক্ষিণ-ভারত

---

* *"The first Indian emperor, more than two thousand year ago, thus entered into possession of that scientific frontier sighed for in vain by his English successors and never held in its entirely even by the Mughal monarchs of the 16th and 17th centuries." (Smith).*

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, ভারতের প্রায় সকল অংশেই চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল এবং এই দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে ভারত উপমহাদেশের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

মৃত্যু ঃ জৈন কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত পরিণত বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং মহীশূরের অন্তর্গত শ্রাবণবেলগোলা নামক স্থানে অনশনে দেহত্যাগ করেন (আনুমানিক ২৯৮-২৯৫ খ্রীষ্টপূর্ব)।

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্বের মূল্যায়ন ঃ যোদ্ধা, সুদক্ষ শাসক ও প্রজাহিতৈষী রাজা হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে অভিহিত হয়েছেন। নন্দ-রাজদের অত্যাচার ও গ্রীকদের শাসন থেকে তিনি ভারতবাসীকে মুক্ত করেছিলেন। গ্রীকদের ভারত থেকে বিতাড়ন ও সেলিউকসের সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্য অর্জন তাঁর সামরিক প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর পূর্বে প্রাচীন ভারতে তাঁর মত আর কেউ এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্য এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঐক্যের যে স্বপ্ন আর্যরা দেখেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। উত্তরে পারস্যের সীমান্ত থেকে দক্ষিণে মহীশূর এবং পূর্বে বঙ্গদেশ থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করে চন্দ্রগুপ্ত সর্বপ্রথম ভারতের রাষ্ট্রীয়-ঐক্য সম্পন্ন করেন। চব্বিশ বছর রাজত্ব করে তিনি গ্রীকদের বিতাড়িত করে, সেলিউকসের আক্রমণ প্রতিহত করে এবং একটি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভারতের রাষ্ট্রীয়-ঐক্যের পথ রচনা করেন। তিনি যথার্থভাবে সার্বভৌম রাজশক্তির বা 'রাজচক্রবর্তীর' আদর্শ স্থাপন করেন। শুধু সাম্রাজ্য স্থাপনই তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব নয়। শাসন ব্যাপারেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীভূত ও প্রজাকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করে তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মেগাস্থিনিস তাঁর শাসন-দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছেন।

ভারতের রাষ্ট্রীয়-ঐক্য

সুশাসক

চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য শুধু যে যোদ্ধা ও সুশাসক ছিলেন তা নয়, তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর নির্মিত রাজপ্রাসাদ, উদ্যান প্রভৃতি তাঁর সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। সে যুগের দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'অর্থশাস্ত্র' ও 'কল্পসূত্রে'র রচয়িতারা তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক

চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের সিংহাসনারোহণের কাল নির্ণয় ঃ চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের সিংহাসনারোহণকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। জৈন কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করে কারপেন্টার (Charpentier) খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৩ অব্দ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের কাল বলে নির্ণয় করেছেন। স্টেইন-এর মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৮, ফ্লিট-এর মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২০ ; স্মিথের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২ ; রাধাকমল মুখার্জীর মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ ; কানিংহামের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫ এবং জয়স্বালের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫।

স্মিথের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হলে গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলের ভারতীয় রাজন্যবর্গ গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে গ্রীক শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। একমাত্র ইউডিমাস কোনক্রমে ক্ষুদ্র অঞ্চলে গ্রীক শাসন অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হন। স্মিথের মতে গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য এবং তিনি আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলের ওপর আক্রমণ চালিয়ে পাঞ্জাব দখল

করেন, কিন্তু স্মিথের মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আলেকজাণ্ডার কর্তৃক বিজিত অঞ্চলে গ্রীক শাসনের ভিত্তি প্রথম থেকেই দুর্বল ছিল। সুতরাং তাঁর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক শাসন উচ্ছেদ করার সুযোগ আসে এবং আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন কারণ ছিল না।

পুনরায় স্মিথের মতে গ্রীকদের বিতাড়িত করার পূর্বেই চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের উচ্ছেদ করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু স্মিথের এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের পরেই চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে মগধের সিংহাসন দখল করা সম্ভব ছিল। 'মুদ্রারাক্ষস'-নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, যে সেনাবাহিনী নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মগধ আক্রমণ করেছিলেন, তাতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসী ও গ্রীক সেনারা অংশগ্রহণ করেছিল। আলেকজাণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই গ্রীকদের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এবং আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাসের মধ্যেই পাঞ্জাবে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটেছিল। সুতরাং, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পূর্বেই চন্দ্রগুপ্ত যে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এতদ্ভিন্ন সিংহলীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুসারে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের ১৬২ বছর পরে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ ঘটেছিল। আলেকজাণ্ডার ভারত ত্যাগ করেন ৩২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। সুতরাং ৩২৪ থেকে ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে ধারণা করা যায়।

বিন্দুসার, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০-২৭৩ ঃ চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের সিংহাসন ত্যাগ করার পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার 'অমিত্রঘাত' (শত্রুনিধনকারী) উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। বহু বিষয়ে পিতার সঙ্গে তাঁর বৈষম্য থাকলেও একথা স্বীকার্য যে, তিনি পিতার নীতি ও সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থকার তারানাথের গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, চাণক্য কিছুকাল বিন্দুসারের মন্ত্রী থেকে রাষ্ট্র শাসনে তাঁর প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। অনেকের মতে বিন্দুসারের আমলে দাক্ষিণাত্য মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। অবশ্য সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে এই ঘটনার উল্লেখ নেই। এস্থলে স্মরণ রাখা দরকার যে, সম্রাট অশোক কেবলমাত্র কলিঙ্গ জয় করেছিল ; কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের পেনার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নয় যে, দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ বিন্দুসারের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল তক্ষশীলার বিদ্রোহ। অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে তক্ষশীলাবাসী বিদ্রোহী হয়েছিল। যুবরাজ অশোক এই বিদ্রোহ দমন করেন। কলিঙ্গ ছাড়া আর কোন রাজ্য তিনি জয় করেছিলেন বলে সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে উল্লেখ নেই। অবশ্য তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের বিবরণ অনুসারে চাণক্য ১৬টি রাজ্যের নৃপতি ও সামন্তদের পরাজিত করে বিন্দুসারের সাম্রাজ্য পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। কিন্তু তারানাথের এই বিবরণ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সৌরাষ্ট্র চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে।

বিন্দুসার পিতার মত গ্রীকদের সঙ্গে সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। মিশর-রাজ দ্বিতীয় টলেমি ও সিরিয়ার অধিপতি এন্টিয়োকস্ যথাক্রমে ডেইমেকস (Deimechos) ও ডায়োনিসাস্ (Dionysus)-কে বিন্দুসারের রাজসভায় রাজদূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হেগেসেনার (Hegesaner)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বিন্দুসার সিরিয়ার অধিপতির নিকট একজন গ্রীক দার্শনিক, মিষ্টি মদ ও কিছু শুষ্ক ডুমুর চেয়ে পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু গ্রীক-আইন অনুসারে পণ্ডিত ব্যক্তির ক্রয় বা বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল বলে এন্টিয়োকস্ গ্রীক দার্শনিক

পাঠাতে পারেন নি। অবশ্য তিনি বিন্দুসারের নিকট মিষ্টি মদ ও শুষ্ক ডুমুর উপহার পাঠিয়েছিলেন।

বিন্দুসার ছিলেন শান্তিকামী ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগী। বৌদ্ধগ্রন্থ অনুসারে তিনি ২৮ বছর রাজত্ব করে পরলোক গমন করেন। পুরাণ অনুসারে তিনি ২৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

অশোক (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩২)

ঐতিহাসিক উপাদান ঃ অশোকের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ থেকে পাওয়া যায়। যথা—

(১) অশোকের শিলালিপি, (২) সিংহলীয় বৌদ্ধ গ্রন্থদ্বয় 'মহাবংশ' ও 'দীপবংশ' এবং (৩) অন্যান্য বৌদ্ধ উপাখ্যান ও গ্রন্থাদি।

অশোকের সিংহাসন লাভ ও অভিষেক ঃ অশোকের সিংহাসন লাভ ও অভিষেককাল নির্ণয় করার ব্যাপারে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ আছে। বৌদ্ধগ্রন্থ 'দীপবংশ' অনুসারে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের ২১৪ বছর পরে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং চার বছর পর তাঁর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ডক্টর রমেশ মজুমদার-এর মতে চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৪ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি ও তাঁর পুত্র বিন্দুসার (২৪+২৭) মোট ৫১ বছর রাজত্ব করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অশোক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর অভিষেকক্রিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে সম্পন্ন হয়। এই চার বছর অভিষেকক্রিয়ার বিলম্বের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। 'দিব্যবদন' ও সিংহলীয় উপাখ্যানসমূহে অশোক ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধের উল্লেখ আছে। এতে বলা হয়েছে যে, অশোক রাধাগুপ্ত নামে এক মন্ত্রীর সহায়তায় অন্যান্য ৯৮ জন ভ্রাতাদের প্রাণনাশ করে সিংহাসনে বসেন। এই কারণে অনেকে তাঁকে 'চণ্ডাশোক' বলে অভিহিত করেছেন। স্মিথ বলেন "ইহা সত্য যে, অশোকের রাজ্যাভিষেক চার বছর বিলম্বে হয়েছিল এবং অশোক ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে বিরোধ সম্পর্কে যে জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে, এই বিলম্ব তা সমর্থন করে"। কিন্তু স্মিথের মতে এই ভ্রাতৃবিরোধের কোন স্বতন্ত্র সাক্ষ্য নেই—সিংহলীয় উপাখ্যানে অশোক কর্তৃক তাঁর ভ্রাতাদের প্রাণনাশের যে বিবরণ দেওয়া আছে তা স্মিথ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে মনে করেন। অশোকের অনুশাসনলিপিতে তাঁর রাজত্বের প্রথম অষ্টাদশ বছর পর্যন্ত তাঁর ভ্রাতা ও ভগিনীদের জীবিত থাকার উল্লেখ রয়েছে। অশোকের পঞ্চম প্রস্তর লিপিতে (Rock Edict V) তাঁর ভ্রাতাদের প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের কথা উল্লিখিত আছে। অবশ্য এ থেকে এইরূপ অনুমান করা যায় না যে, তাঁর ভ্রাতারা জীবিত ছিলেন। অপরদিকে, তাঁর ভ্রাতারা জীবিত ছিলেন না—এইরূপ নিদর্শনও পাওয়া যায় না। তবে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, সিংহাসন আরোহণের চার বছর পরে অশোকের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অশোকের রাজত্বকালের প্রথম চার বছর রহস্যাবৃত এবং স্মিথের মতে এই সময়টি ছিল "One of the dark spaces in the spectrum of Indian History."

মতভেদ

অশোকের প্রথম জীবন ঃ অশোকের শিলালিপি ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি থেকে অশোকের রাজত্বকালের অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এগুলিতে তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে বিন্দুসারের মহিষীদের সংখ্যা ছিল ১৬ এবং তাঁর পুত্রদের সংখ্যা ছিল ১০১। সুশিমা ছিলেন জ্যেষ্ঠ, অশোক ছিলেন দ্বিতীয় এবং তিস্য ছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র। উত্তর-ভারতীয় কিংবদন্তী অনুসারে অশোকের মাতার নাম ছিল 'সুভদ্রাঙ্গী'। দক্ষিণ-

প্রথম জীবন সম্পর্কে তথ্যাদির স্বল্পতা

ভারতীয় কিংবদন্তী অনুসারে তাঁর মাতার নাম ছিল 'ধর্ম'। সুভদ্রাঙ্গী ছিলেন চম্পাদেশীয় এক ব্রাহ্মণ-কন্যা। অশোকের মাতা ব্যতীত বিন্দুসারের আরও অনেক পত্নী ও উপপত্নী ছিলেন। ১৮ বছর বয়সে বিন্দুসারের রাজত্বকালে অশোক প্রথমে উজ্জয়িনী ও পরে তক্ষশীলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উজ্জয়িনী ও তক্ষশীলার শাসনকর্তা

উজ্জয়িনীতে অবস্থানকালে অশোক মহাদেবীকে বিবাহ করেন। তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন করে অশোক পিতার প্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 'দেবানাম-পিয়-পিয়দাসী' অর্থাৎ দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী এই উপাধি ধারণ করেন। একমাত্র সাহিত্যে ও 'মাস্কি লিপি' ও 'জুনাগড় লিপি' নামক দুটি শিলালিপিতে 'অশোক' নামটি পাওয়া যায়।

সিংহাসনারোহণ

অশোকের রাজত্বকালের প্রথম কয়েক বছরের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নি। তিনি আমোদ-প্রমোদ, মৃগয়া ও যুদ্ধবিগ্রহাদি পছন্দ করতেন। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন পৌরাণিক ধর্মাবলম্বী। কলিঙ্গ যুদ্ধে তাঁর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেয় এবং তিনি বিশ্বের এক অন্যতম মহান্ সম্রাট বলে স্বীকৃতি লাভ করেন।

রাজত্বকালের প্রথম চার বছরের বিবরণ

রাজত্বের প্রথম তের বছর অশোক পিতা ও পিতামহের অনুসৃত স্বদেশে সাম্রাজ্যবিস্তার ও বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার নীতি অনুসরণ করে চলেন। তিনি স্বদেশে ছিলেন পররাজ্যগ্রাসী কিন্তু বহির্দেশে ছিলেন শান্তিকামী। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি রাষ্ট্রদূত বিনিময় করতেন এবং বিদেশীদের শাসনকার্যে নিযুক্ত করতেও দ্বিধা করতেন না। এই প্রসঙ্গে এক পারসিক কর্মচারী তুসাস্পার নাম উল্লেখ করা যায়।

কলিঙ্গ জয় ঃ অভিষেকের নবম বছরে (খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০) অশোক কলিঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। এই রাজ্য ছিল ওড়িষ্যার এক অংশ বিশেষ। সেই সময় কলিঙ্গ রাজ্য বাংলাদেশের সুবর্ণরেখা নদী থেকে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের ত্রয়োদশ প্রস্তরলিপিতে (Rock Edict XIII) এই যুদ্ধের বিবরণ ও ফলাফল উল্লিখিত আছে। নন্দরাজদের আমলে কলিঙ্গ মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু প্লিনির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে কলিঙ্গ মগধের শাসনাধীন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অশোকের সময় কলিঙ্গ একটি পরাক্রান্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। সুতরাং নিজরাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার্থে অশোককে কলিঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে হয়। এ ভিন্ন, দক্ষিণ-ভারতের জল ও স্থলপথগুলি ছিল কলিঙ্গের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং এই কারণে মৌর্য সাম্রাজ্যের মধ্যে তার অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন ছিল। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০ অব্দে অশোক কলিঙ্গ অভিযানে অগ্রসর হন। কলিঙ্গবাসী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও অবশেষে পরাজিত হয় এবং তা মৌর্য সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। এই যুদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ কলিঙ্গবাসী বন্দী ও প্রায় এক লক্ষ নরনারী প্রাণ হারায়।

যুদ্ধের কারণ

যুদ্ধ

কলিঙ্গ যুদ্ধ মগধ তথা ভারত-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা।* এই যুদ্ধের ফলে এযাবৎ মগধ-রাজগণ কর্তৃক অনুসৃত পররাজ্য গ্রাস নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং এর পরিবর্তে সাম্য,

---

* *"The Conquest of Kalinga was a great land-mark in the history of Magadha and of India"—H. C. Roychowdhuri.*

মৈত্রী, সামাজিক অগ্রগতি ও ধর্মপ্রচারের যুগ শুরু হয়। দিগ্বিজয় নীতি পরিত্যক্ত হলে এবং ধর্মবিজয় নীতি গৃহীত হলে মগধের সামরিক শক্তিরও অবক্ষয় হয়। অশোক নিজে মৈত্রী ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নিদারুণ হত্যালীলা ও কলিঙ্গবাসীর অপরিসীম দুর্দশা অশোকের মনে গভীর অনুশোচনার উদ্রেক করেছিল। এই কারণে চিত্তের প্রশান্তির জন্য তিনি গতানুগতিক যুদ্ধ-নীতির পথ পরিত্যাগ করে উপগুপ্ত নামে এক সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অশোক' নামক গ্রন্থে মন্তব্য করে বলেছেন যে, কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম অশোকের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনের রূপান্তর ঘটায়। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে যে, কলিঙ্গজয়ের অব্যবহিত পরেই তিনি দেবানাং প্রিয় ধর্মের অনুসরণ করে ও ধর্মের প্রেমে মানুষের মনে ধর্ম বিষয়ে আগ্রহ জাগরিত করার ব্যাপারে ব্রতী হয়েছিলেন এবং অহিংসাকে জীবনে মহান্ ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ ভিন্ন তিনি নিশ্চিত ভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য অশোকের বৌদ্ধধর্মের প্রতি আসক্তির ফলে ভারতে ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন না ঘটলেও, ভারতীয় রাজার রাজকীয় কর্তব্যের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। অশোকই সর্বপ্রথম রাজকীয় কর্তব্যকে প্রজাদের প্রতি ঋণ পরিশোধ হিসেবে গ্রহণ করেন। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' উল্লিখিত রাজকীয় কর্তব্যের সঙ্গে অশোকের রাজ-কর্তব্যবোধের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মগধের প্রাচীন রাষ্ট্রীয় আদর্শ অনুসারে রাজা ছিলেন নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। এই দিক থেকে অশোকের নতুন রাষ্ট্রাদর্শ সত্যই বিস্ময়কর। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে রাজ্যশাসনের ব্যাপারে রাজার কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের লাভ ও শাসনযোগ্যতা। সুতরাং প্রজাবর্গের নিকট অশোক-বিঘোষিত দায়বোধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে অশোক-ই এযাবৎ আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে ও আমলাতন্ত্রের অনুকূলে পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অধিকতর জনকল্যাণকামী করে তোলেন। রাষ্ট্রনীতির ওপর কলিঙ্গজয়ের এটিই হল তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া।

ফলাফল ও গুরুত্ব

রাষ্ট্রনীতি ও ব্যক্তিজীবনে পরিবর্তন

অশোক মৈত্রীনীতি অবলম্বন করে বহু গ্রীক রাজাদের মিত্রতা লাভ করেছিলেন। সম্ভবত অশোক বিশ্বাস করতেন যে, জনকল্যাণমূলক সরকারের এক নজীর স্থাপন করে তিনি প্রতিবেশী রাজন্যবর্গকে তাঁর নীতি ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবেন এবং এইভাবে তিনি সভ্যজগতের নৈতিক নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন। কিন্তু ব্যাসামের মতে অশোক কখনই সাম্রাজ্যবাদী আকাঙক্ষা পরিত্যাগ করেন নি। তিনি বৌদ্ধধর্মের নৈতিক আদর্শের দ্বারা সেই আকাঙক্ষা কিছুটা রূপান্তর করতে চেয়েছিলেন মাত্র।*

কলিঙ্গ জয় ও ধর্মান্তরের ফলে অশোকের ব্যক্তিগত জীবনে ও আচার-ব্যবহারে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। রাজপরিবারের চিরাচরিত প্রথা ও অনুষ্ঠানের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। রাজ্যের সর্বত্র প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ হয় ও সেই সঙ্গে রাজকীয় রন্ধনশালায় আহার্যের জন্য প্রাণিহত্যাও নিষিদ্ধ হয়। [৬.১৩ ও ৬.১৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন : কলিঙ্গ যুদ্ধ শুধু অশোকের ধর্মমতেরই পরিবর্তন করেছিল এমন নয়, পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ নীতিতেও তা প্রতিফলিত হয়েছিল। কলিঙ্গ-প্রস্তরলিপিতে তিনি ঘোষণা করেন যে, অতঃপর প্রতিবেশী রাজ্যগুলির শাসকরা যেন মৌর্য সাম্রাজ্যের

* *"He (Asoka) by no means gave up his imperial ambitions, but modified them in accordance with the humanitarian ethics of Buddhism"—Basham—The wonder that was India*—পৃঃ ৫৫।

সামরিক শক্তিতে ভীত না হন এবং তিনি তাঁদের দুঃখের কারণ না হয়ে সুখেরই কারণ হবেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ধর্মবিজয়ই হল একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিজয়। তিনি মৌর্য সম্রাটদের অনুসৃত দিগ্বিজয় নীতি পরিত্যাগ করে ধর্মবিজয় নীতি জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। এই নতুন নীতি ঘোষণা করা ছাড়াও অশোক তাঁর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদের দিগ্বিজয়-নীতি বর্জন করার উপদেশ দান করেন। এই নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার নিদর্শনস্বরূপ অশোক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দাক্ষিণাত্যের চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি রাজ্যগুলি মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করার কোন উদ্যোগ করেন নি। বরঞ্চ তাদের মিত্রতালাভেই তিনি অধিক যত্নবান হয়েছিলেন।

দিগ্বিজয় নীতি বর্জন ও ধর্মবিজয় নীতি গ্রহণ

অভ্যন্তরীণ নীতির পরিবর্তন ঃ অশোকের ধর্মমতের পরিবর্তন অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। জনসাধারণের তথা জীবমাত্রেরই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলসাধন করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(ক) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ঃ প্রথমত, তিনি প্রতি তিন ও পাঁচ বছর অন্তর 'রাজুক', 'প্রাদেশিক' ও 'মহামাত্র' প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের রাজ্যপরিক্রমায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। 'যুত', 'রাজুক' ও 'প্রাদেশিকদের' প্রধান দায়িত্ব ছিল ধর্মপ্রচার করা। মহামাত্রদের প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচার ও অবিচার থেকে প্রজাবর্গকে রক্ষা করা।

দ্বিতীয়ত, উপরোক্ত কর্মচারীরা ছাড়াও অশোক 'ধর্মমহামাত্র' ও 'ধর্মযুত' নামে আর এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করেন। ধর্মমহামাত্রদের দায়িত্ব ছিল ধর্মপ্রচার করা এবং ব্রাহ্মণ, যবন ও জৈনদের রক্ষা করা ও স্থানীয় বিচারকার্য পরিচালনা করা।

তৃতীয়ত, ধর্মপ্রচারের সহায়ক হিসেবে তিনি ধর্মযাত্রা, ধর্মমঙ্গল, ধর্মসমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও প্রথায় উৎসাহ দান করতে থাকেন।

চতুর্থত, রাজকীয় বার্তাবহদের নিযুক্ত করে তিনি রাজ্যের সকল সংবাদ ও রাজকর্মচারীদের কর্তব্য পালন সম্পর্কে অবহিত থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(খ) ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা ঃ শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে অশোক সকলকে মৈত্রী ও অহিংসা পালনের উপদেশ দান করেন। রাজকর্মচারীদের সহায়তায় এবং শিলাস্তম্ভে ও পর্বতগাত্রে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ সহজ ভাষায় উৎকীর্ণ করে তিনি স্বদেশে ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভারতের বাইরেও তিনি ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন।

(গ) জনকল্যাণমূলক কার্যাদি ঃ মৈত্রী ও অহিংসার আদর্শ সার্থক করার উদ্দেশ্যে অশোক মৃগয়া ও জীবহত্যা নিষিদ্ধ করেন। দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ভিক্ষার ব্যবস্থা করেন। জনসাধারণের উপকারের জন্য প্রশস্ত রাজপথ, অতিথিশালা, মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি নির্মাণের ব্যবস্থাও করেন।

এইভাবে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে অশোক শাসনব্যবস্থাকে মানবধর্মী ও জনকল্যাণকামী করে তুলতে যত্নবান হন।

অশোকের ধর্ম ও ধর্মনীতি ঃ প্রথম জীবনে অশোক ছিলেন শিবের উপাসক। কল্‌হন্ রচিত 'রাজতরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণাম তাঁর হৃদয়ে গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি করে। চিত্তের প্রশান্তির জন্য তিনি উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অবশ্য কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতাই অশোকের ধর্মান্তকরণের একমাত্র কারণ বলে অনেকে মনে করেন না। কোশাম্বি ও রোমিলা থাপার এর মূল কারণ হিসেবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন যদিও তাঁদের ব্যাখ্যা সর্ববাদী

সম্মত নয়। কোশাম্বির মতে অশোকের সময় মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি দৃঢ় শ্রেণীভিত্তি রচিত হয়েছিল এবং এর ফলে শ্রেণীসংঘাত প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এই শ্রেণীসংঘাতের সম্ভাবনা দূর করার উদ্দেশ্যেই অশোক বৌদ্ধধর্মের মত এক বিশ্বজনীন ধর্ম গ্রহণ করেন। রোমিলা থাপারের মতে মৌর্যযুগে নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির উদ্ভব হওয়ায় সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সমাজে বণিক্ ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ সামাজিক স্বীকৃতি লাভের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। বৌদ্ধধর্ম-জনিত সমাজ-সচেতনতা রাষ্ট্রের সম্মুখে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তা ছাড়া মৌর্যরাষ্ট্র অতিমাত্রায় কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের কেন্দ্রাভিমুখী কাঠামোর সংরক্ষণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর ও জাতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে অশোক একটি নতুন ধর্মমত গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন যেমন পরবর্তী কালে সম্রাট আকবর করেন। অশোকের এই ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের নতুন সংস্করণ বলা যায়। অশোক কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ : কারণ

তাঁর অপ্রধান প্রথম শিলালিপিতে (Minor Rock Edict I) উল্লেখ আছে যে, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর উপগুপ্তের সঙ্গে অশোক বৌদ্ধ তীর্থভ্রমণে বের হন। তিনি একে একে কপিলাবস্তু, লুম্বিনী, কুশীনগর, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি পরিভ্রমণ করেন। প্রত্যেক তীর্থস্থানে তিনি প্রচুর উপহার বিতরণ করেন ও বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি রাজ্যের নানাস্থানে স্তূপ, স্তম্ভ ও পাহাড়ের গায়ে বুদ্ধের বাণী সহজ ভাষায় উৎকীর্ণ করেন। দেশ-দেশান্তরে বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য তিনি ধর্মপ্রচারক পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এদের আন্তরিক চেষ্টায় সিরিয়া, মিশর, এপিরাস, সিংহল প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ-সঙ্ঘের সঙ্গেও অশোক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে যত্নবান হয়েছিলেন। সঙ্ঘের পবিত্রতা, সংহতি ও ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রতি নানারূপ উপদেশ দান করতেন। দেশ ও বিদেশে এই ধর্মপ্রচারকল্পে তিনি বহু কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

বৌদ্ধ অশোক

বৌদ্ধ-সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক

বৌদ্ধধর্মের প্রতি অশোকের শ্রদ্ধাশীলতার প্রমাণ সমসাময়িক সাহিত্যে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম ও সঙ্ঘের মধ্যে সংহতি স্থাপনের জন্য তিনি পাটলিপুত্র নগরে একটি বৌদ্ধ-সংগীতি (তৃতীয় বৌদ্ধ-সংগীতি) আহ্বান করেন। এর ফলে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঐক্য পুনস্থাপিত হয় এবং সঙ্ঘগুলি থেকে বহু অনাচার বিদূরিত হয়।

তৃতীয় বৌদ্ধ-সংগীতি

অশোকের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম কিনা এই প্রশ্ন সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ আছে। অশোকের ধর্ম-নীতির সঙ্গে বৌদ্ধ ও অপরাপর ধর্মের সাদৃশ্য থাকায় ঐতিহাসিক মহলে এই প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। ফ্লিটের মতে, অশোকের ধর্ম ছিল সর্বতোভাবে নীতিমূলক। ফ্লিট মনে করেন, অশোকের ধর্ম ছিল রাজধর্মের প্রতিবিম্ব। রাজনৈতিক ও নৈতিক অনুশাসনের মাধ্যমে প্রজাপালন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল। রিজ্ ডেভিড্‌স্-এর মতে অশোকের ধর্মকে কোন একটি বিশিষ্ট ধর্ম না বলে কর্তব্যকর্মের নীতি বলাই সমীচীন। পানিকরের মতে, অশোকের ধর্ম ও হিন্দুধর্ম অভিন্ন এবং যে বিচারে হর্ষবর্ধনকে বৌদ্ধ ও কুমার পালকে জৈন বলা হয়ে থাকে, সেই বিচারেই অশোককে বৌদ্ধ বলা যেতে পারে। অশোক একান্তই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে বিষয়েও উইলসন প্রমুখ ঐতিহাসিকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ভাণ্ডারকর, বড়ুয়া, রায়চৌধুরী প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে অশোক যথার্থই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁরা অশোকের গৌণ প্রথম

অশোকের ধর্ম সম্পর্কে মতভেদ

প্রস্তরলিপির (Minor Rock Edict I) উল্লেখ করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বৎসরাধিকাল গৃহী উপাসকের মত জীবনযাপন করেছিলেন। ভাবরু-লিপিতে বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার আভাস পাওয়া যায়। এ ছাড়া স্তূপ, স্তম্ভ ও পর্বতগাত্রে বুদ্ধের বাণী উৎকীর্ণ করা, বৌদ্ধ-সঙ্ঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি ব্যাপারেও অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বুদ্ধকে ভগবৎ হিসেবে মনে করতেন। বুদ্ধের বাণী সত্য বলে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং তা প্রকাশ্যে ঘোষণাও করতেন। বৌদ্ধ তীর্থদর্শন বুদ্ধের প্রতি তার শ্রদ্ধার পরিচয় বহন করে। বৌদ্ধ-সঙ্ঘের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতেও তিনি ছিলেন যত্নবান। অভিষেকের নবম বছরে অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের স্বপক্ষে যুক্তি

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেও অশোকের প্রচারিত ধর্ম বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা অধিক উদার ও মানবধর্মী ছিল। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন তা সকল ধর্মের মূল কথা। এই ধর্মের লক্ষ্য ছিল মানুষের মনে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগরিত করা এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা। মানবতাবাদী সমাজ গড়ে তোলাই অশোকের ধর্মের প্রধান লক্ষ্য ছিল। রোমিলা থাপারের ভাষায়, "It was a plea for the recognition of the dignity of man and for a humanistic spirit in the activities of society" (A History of India—Vol—I p.—86)। তিনি বৌদ্ধধর্মের বিধান সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। বুদ্ধের উপাসনা অথবা নির্বাণলাভের সম্বন্ধেও কিছুই বলেন নি। বৌদ্ধধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ না করে ধর্মের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতিই বেশী জোর দিয়েছিলেন। তিনি কোন নতুন ধর্মমত প্রবর্তন বা বৌদ্ধধর্মের সংস্কারসাধন করার চেষ্টা করেন নি। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ, বৌদ্ধতীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ এবং বৌদ্ধ-সঙ্ঘের* সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও অশোক কতকগুলি ব্যবহারিক নীতির প্রচার করে মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর নীতিমূলক নির্দেশগুলি ছিল এইরূপ, যেমন—দয়া, দান, সত্য, শুচিতা ও সাধুতা ; পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ; ব্রাহ্মণ, জৈন ও শ্রমণদের প্রতি ভক্তি, দাস ও ভৃত্যদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও অহিংসা। অশোক সমাধি বা নির্বাণলাভের উপায় সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। তিনি বলেছেন স্বর্গের কথা এবং স্বর্গলাভের জন্য উপরোক্ত অনুশাসনের নির্দেশ দিয়েছিলেন মাত্র। দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে তাঁর ধর্মনীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, ধর্ম হচ্ছে "পাপের স্বল্পতা, কল্যাণধর্মের প্রাচুর্য, দয়া, সত্য ও শৌচ"। ডঃ মজুমদারের মতে, প্রকৃতপক্ষে অশোক ধর্মের নামে যা প্রচার করেছিলেন তা ধর্ম অপেক্ষা ছিল মূলত নৈতিক অনুশাসন।*

ধর্মানুশীলনের নির্দেশ

বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হয়েও অশোক পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নৈতিক আদর্শচ্যুত আচার-অনুষ্ঠানের অবসান করাই তাঁর ধর্মনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল। পরধর্মসহিষ্ণুতা তাঁর ধর্মনীতিকে মহিমান্বিত করেছিল। তিনি কখনও দেবতা, ব্রাহ্মণ অথবা অপর কোন ধর্মসঙ্ঘের

---

* *বৌদ্ধ-সংগীতি বা সভা : বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁর শিষ্যরা মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে রাজগৃহে এক অধিবেশনে মিলিত হন। এই সভা 'বৌদ্ধ-সংগীতি' নামে পরিচিত। এই সভায় বুদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়। এর একশত বছর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় 'বৌদ্ধ-সংগীতি' অনুষ্ঠিত হয়। অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে তৃতীয় 'বৌদ্ধ-সংগীতি' এবং কণিষ্কের রাজত্বকালে শেষ বা চতুর্থ 'বৌদ্ধ-সংগীতি'র অধিবেশন বসে।*

* *আর. সি. মজুমদার—"The aspect of Dharma which he (Asoka) emphasised was a code of morality rather than a system of religion".*

প্রতি অশ্রদ্ধাভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণুতায় পরম বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পরও তিনি নিজেকে 'দেবানাম পিয় পিয়দর্শী' বা 'দেবতাদের প্রিয়' বলে অভিহিত করতেন। তিনি ব্রাহ্মণ বা শ্রমণদের প্রতি অসদ্ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করতেন। তাঁর ধর্মমহামাত্রদের প্রধান দায়িত্ব ছিল ব্রাহ্মণ, জৈন ও শ্রমণদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মঙ্গলসাধন করা। তাঁর দ্বাদশ প্রস্তরলিপিতে উল্লেখ আছে যে, তিনি 'আজিবক' নামক এক ধর্মীয় সম্প্রদায়কে প্রচুর উপহার দান করেছিলেন। কিন্তু পরধর্মে সহিষ্ণু হওয়া সত্ত্বেও সকল ধর্মসম্প্রদায়ের যথেচ্চচারিতার তিনি বিরোধিতা করতেন। তিনি পশুবলি ও জীবহিংসার তীব্র নিন্দা করতেন এবং তা তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন।

পরধর্মসহিষ্ণুতা
'দেবনাম পিয় পিয়দর্শী'

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অশোক যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন তা হুবহু বৌদ্ধধর্ম ছিল না। এতে নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কোন স্থান ছিল না এবং বৌদ্ধ-সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত থাকার নির্দেশও তিনি কখনও দেন নি। অশোক তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম-বিশ্বাস ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এক নির্দিষ্ট পার্থক্য বজায় রাখতে সর্বদাই যত্নশীল ছিলেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মোপদেশে কোন বিশেষ ধর্মীয় তত্ত্বের ও দর্শনের ইঙ্গিত ছিল না। বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব যথা—'আর্যসত্য', 'অষ্টমার্গ', 'নির্বাণ' ইত্যাদি অশোকের প্রচারিত ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অপরদিকে, এতে কতকগুলি সাধারণ অবৌদ্ধতত্ত্বের মিশ্রণ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন তাতে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান ছিল না। গৃহী, সন্ন্যাসী, উচ্চ ও নিম্ন সকল শ্রেণীর সমর্থনলাভের উপযোগী ছিল তাঁর ধর্ম। কোন নির্দিষ্ট আইন-বিধির ওপর অশোকের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বহু বিষয়ে এই ধর্ম সুস্পষ্ট ছিল না। অহিংসা ছিল তাঁর ধর্মের মূল কথা। তাঁর অহিংস আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যজয় পরিহার করা এবং প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকা। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি প্রয়োজনবোধে অহিংস-নীতি অনুসরণ না করারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য আদিম বন্য উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করার ব্যাপারে তিনি অহিংস-নীতি সাময়িকভাবে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

অশোকের ধর্ম-নীতি ছিল জনকল্যাণমূলক। মানুষ ও পশু, সকল জীবের জন্য রাস্তার দুধারে বৃক্ষরোপণ, পুষ্করিণী খনন, বিশ্রামাগার স্থাপন ইত্যাদি জনহিতকর কার্যাদির ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে অশোকের ধর্মমতকে বৌদ্ধধর্মের সংশোধিত সংস্করণ বা অশোকবাদ (Asokism) বলা যায়।

অশোকের প্রচারিত ধর্ম বা ধম্ম সাফল্যলাভ করতে পারে নি। এর প্রধান কারণ হল তাঁর অতুৎসাহিতা যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সন্দেহের সঞ্চার করেছিল। মূলত যে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি ধর্মপ্রচার করেছিলেন, তা সমাধান করার মত সুনির্দিষ্ট পথ তিনি প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হন। তাঁর সময়েও সামাজিক অস্থিরতা ও ধর্মীয় সংঘাত অল্প-বিস্তর অব্যাহত থাকে, যার সুষ্ঠু প্রতিকার করতে অশোক ব্যর্থ হন। তাঁর সমর্থনে একথা বলা যায় যে, তিনি ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নীতির প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং তা নির্ধারণ করার জন্য তিনি যত্নবানও হয়েছিলেন।*

অশোকের প্রচারিত অসাফল্যতা

অশোকের ধর্মপ্রচার ঃ অশোক বৌদ্ধধর্মের একজন পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই ধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণতি লাভ করে।

---

* *রোমিলা থাপার—History of India—Vol—I পৃঃ—৮৮।*

অশোকের মৃত্যুর দু'হাজার বছর পরে আজও বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জনগণ এই ধর্মে বিশ্বাসী—এটি অশোকেরই কৃতিত্ব।

অশোক নিজে বিহারযাত্রার (Pleasure tour) পরিবর্তে ধর্মযাত্রার প্রচলন করেন। বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পরিভ্রমণ ; ধর্মসভার আহ্বান ; ব্রাহ্মণ, শ্রমণদের উপহার দান ও বুদ্ধের বাণী প্রচার করে তিনি জনসাধারণকে ধর্মভাবাপন্ন করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

(১) রাজার ধর্মযাত্রা স্বদেশে

জনসাধারণের মনে ধর্মভাবের উন্মেষ করার জন্য তিনি পর্বতগাত্রে, প্রস্তরখণ্ডে, স্তূপ ও প্রস্তরস্তম্ভে সহজবোধ্য ভাষায় ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি উৎকীর্ণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

(২) ধর্মলিপি

ধর্মানুশীলনের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ জাগিয়ে তুলবার জন্য তিনি 'রাজুক', 'যুত', 'মহাপাত্র' উপাধিধারী রাজকর্মচারী নিযুক্ত করে সর্বত্র ত্রৈবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিক্রমার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজুকদের উদ্দেশ্যে চতুর্থ স্তম্ভলিপিতে তিনি এইরূপ বলেছেন "পিতা যেমন সুদক্ষ ধাত্রীর হাতে সন্তান পালনের দায়িত্ব ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত থাকেন, তিনিও সেইরূপ এদের হাতে প্রজাদের মঙ্গল অর্পণ করে নিশ্চিন্ত আছেন।"

(৩) রাজকর্মচারী নিয়োগ

জনসাধারণ যাতে নীতিপথে জীবনযাপন করতে পারে এবং রাজকর্মচারীগণ কর্তৃক যাতে তারা নির্যাতিত না হয়, সেজন্য তিনি 'ধর্মমহামাত্র' নামে অপর এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন।

(৪) ধর্মমহামাত্র নিয়োগ

বৌদ্ধধর্মের বিশুদ্ধতা ও বৌদ্ধসঙ্ঘের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে তিনি পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ-সংগীতি বা সভা আহ্বান করেছিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন মোগ্‌গালিপুত্ত। এই সভার সিদ্ধান্ত সারনাথ স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ করা হয়।

(৫) বৌদ্ধসভা

তৃতীয় বৌদ্ধ-সংগীতির সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি নিম্নলিখিত ধর্মপ্রচারকদের দেশের বিভিন্ন অংশে পাঠিয়েছিলেন—মজ্‌ঝান্তিক—কাশ্মীর ও গান্ধার ; মজ্‌ঝিম—নেপাল ; মহাধর্ম রক্ষিত—মহারাষ্ট্র, মহাদেব—মহীশূর ; রক্ষিত—বারাণসী। উপরোক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়াও অশোক দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি অঞ্চলেও বৌদ্ধ প্রচারক পাঠিয়েছিলেন।

(৬) বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রেরণ

স্বদেশে ধর্মপ্রচার করেই অশোক নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বিদেশে ধর্মপ্রচারেও তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'মহাবংশ' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, তাঁর প্রেরিত প্রচারকরা পশ্চিম-এশিয়া, ব্রহ্মদেশ, মিশর ও গ্রীসেও গমন করেছিলেন। সিংহলে দূত হিসেবে অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে প্রেরণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক সাণ্ডার্স-এর মতে অশোকের ধর্মপ্রচারকরা এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসীদের মধ্যে কৃষ্টিমূলক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বৈদেশিক কয়েকটি রাষ্ট্রে অশোক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন।

বিদেশে ধর্মপ্রচার

অশোক তাঁর ত্রয়োদশ প্রস্তরলিপিতে দাবি করেছেন যে, তাঁর প্রেরিত দূতরা গ্রীক-শাসিত মিশর, সিরিয়া, সাইরিন এবং এপিরাস অথবা করিন্থের (গ্রীস) রাজসভায় সমাদৃত হয়েছিলেন। অবশ্য ইওরোপীয় পণ্ডিতরা গ্রীকরাজ্যগুলি সম্পর্কে অশোকের দাবি 'রাজকীয় বাগাড়ম্বর' ও অহমিকার প্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, অশোক গান্ধার ও অন্যান্য গ্রীক রাজ্যে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন এবং এই ধর্মপ্রচারের সঙ্গে মহারক্ষিত

নামে এক বৌদ্ধ আচার্যের নাম পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে তা জানা যায় যে, অশোক গ্রীক দেশগুলিতে মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং অশোকের এই জনহিতকর ও মানবিক কার্যাবলী গ্রীকদের স্পর্শকাতর মনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। সিলভাঁ লেভির রচনা থেকে জানা যায় যে, অশোকের তিরোধানের অল্পকালের মধ্যে বহু গ্রীক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। সুতরাং এ যে, অশোকের ধর্মপ্রচারের ফলশ্রুতি তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে অশোকের ধর্মপ্রচারকরাই যে আফ্রিকা ও গ্রীক দেশগুলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সফল হয়েছিল এমন কথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।*

অশোকের শিলালিপি ঃ অশোকের শিলালিপিগুলি পর্বতগাত্রে, প্রস্তরস্তম্ভে ও পর্বতগুহায় উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক শিলালিপিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে** ; কিন্তু অশোকের সকল শিলালিপিগুলিই যে আবিষ্কৃত হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। শিলালিপিগুলি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠি অক্ষরে লিখিত। শিলালিপিগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হল।

(১) **গৌণ প্রস্তর-লেখমালা ঃ** প্রথম গৌণ প্রস্তর-লেখমালাতে অশোকের ব্যক্তিগত জীবনের আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রস্তর-লেখমালাতে অশোকের ধর্মের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই লিপিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, যথা—বিরাট (জয়পুর), জাতিঙ্গ-রামেশ্বর (মহীশূর), সাহাবাদ (বিহার), রূপনাথ (জব্বলপুর), মাস্কি (হায়দ্রাবাদ)। অশোকের অভিষেকের ত্রয়োদশ বর্ষে এই লিপিগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল।

(২) **ভাবরু-লিপি ঃ** অশোকের অভিষেকের ত্রয়োদশ বর্ষে এই লিপিখানি উৎকীর্ণ হয়েছিল। এতে বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রতি অশোকের কিছু উপদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৩) **চতুর্দশ প্রস্তরলিপি ঃ** এই লিপিগুলি থেকে অশোকের রাষ্ট্র-শাসন নীতির আভাস পাওয়া যায়। এই সকল লিপিগুলি সীমান্ত প্রদেশেই আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ২৫৭ ও ২৫৬ অব্দের মধ্যেই এই লিপিগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। এই লিপিগুলিতে অশোক কর্তৃক মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, মহামাত্রদের প্রতি অশোকের পরধর্মসহিষ্ণুতা সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোকের অভিষেকের চতুর্দশ বছরে এই লিপিগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল।

(৪) **কলিঙ্গ লিপি ঃ** ধোলি ও জৌগড়ে প্রাপ্ত কলিঙ্গ লিপি দুটি চতুর্দশ প্রস্তরলিপির অন্তর্গত। এই দুটিতে কলিঙ্গবিজয় ও তাঁর শাসনের কথা উল্লিখিত আছে।

(৫) **বরাবর গুহালিপি ঃ** গয়ার কাছে বরাবর পর্বতগুহায় খ্রীষ্টপূর্ব ২৫৭ ও ২৫০ অব্দের মধ্যে এই লিপিগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। এ থেকে জানা যায় যে, অশোক বরাবর পর্বতের

---

* *সুনীল চট্টোপাধ্যায়—উল্লিখিত গ্রন্থ—পৃঃ ৩০০-৩০২।*

** ***শিলালিপিগুলি ও আবিষ্কারকগণ ঃ***

(১) বরাবর ও নাগার্জুন গুহালিপি	*হ্যারিস্টন (১৭৮৫)*
(২) গার্নার-প্রস্তরলিপি	*টড (১৮২২)*
(৩) সাহাবাজগড়ী লিপি	*কোট (১৮৩৬)*
(৪) ভাবরু-প্রস্তরলিপি	*কেপ্টেন বার্ট (১৮৪০)*
(৫) জৌগড়-প্রস্তরলিপি	*ওয়াল্টার ইলিয়ট্ (১৮৫০)*
(৬) কালসী-প্রস্তরলিপি	*ফরেস্ট (১৮৬০)*
(৭) বৈরাট-প্রস্তরলিপি	*কারলাইল (১৮৭২)*
(৮) মহীশূর-প্রস্তরলিপি	*রাইস (১৮৯১)*

গুহাগুলি আজিবক সম্প্রদায়কে উৎসর্গ করেছিলেন। এ থেকে অশোকের পরধর্মসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) **রুমিনদেই স্তম্ভলিপি** ঃ নেপালের কাছে রুমিনদেই সপ্তম-স্তম্ভলিপিগুলি থেকে অশোকের বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পরিভ্রমণের সংবাদ পাওয়া যায়। এইগুলিতে বুদ্ধের প্রকৃত জন্মস্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়।

(৭) **সপ্তম-স্তম্ভলিপি** ঃ অশোকের অভিষেকের ষড়বিংশতি ও সপ্তবিংশতি বর্ষে স্তম্ভলিপিগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল। তার দুটি বর্তমানে দিল্লীতে রক্ষিত আছে। এইগুলি মীরাট, পাঞ্জাবের আম্বালা জেলা, ত্রিহুত জেলা প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

(৮) **ক্ষুদ্র-স্তম্ভলিপি** ঃ এইগুলি সাঁচী, সারনাথ ও কৌশাম্বী প্রভৃতি স্থানে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। বৌদ্ধসঙ্ঘের সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে অনুশাসনগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল।

অশোকের শিলালিপিগুলির গুরুত্ব ঃ অশোকের শিলালিপিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, এইগুলি থেকে অশোকের জীবনী ও তাঁর কৃতিত্বের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এইগুলি থেকে (১) কলিঙ্গ-যুদ্ধের পূর্বে অশোকের জীবনবৃত্তান্ত, (২) কলিঙ্গ-যুদ্ধের ভয়াবহতা, (৩) অশোকের অন্তরে কলিঙ্গ-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া; (৪) বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোকের প্রচেষ্টা, (৫) অশোক কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন; (৬) প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে অশোকের সম্পর্ক, (৭) অশোকের আমলে জনসাধারণের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বহু বিষয় জানা যায়।

ইতিহাসে অশোকের স্থান ঃ বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে অশোক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। মানুষ ও শাসক হিসেবে অশোক ভারত উপমহাদেশ তথা বিশ্বের রাজন্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছেন। তিনি ছিলেন মহান্ ও আদর্শস্থানীয় নরপতি। রাজকর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অতি উচ্চ। প্রজাবর্গকে তিনি সন্তানতুল্য মনে করতেন এবং তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর শক্তি, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও গঠনমূলক কার্যের উপযোগী ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কলিঙ্গ-যুদ্ধ তাঁর সামরিক ও রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দেয়। এর কয়েক বছরের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার দ্বারা তিনি বৌদ্ধধর্মকে এক বিশ্বজনীন মহাধর্মে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইওরোপের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করে তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক মহান্ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মৈত্রী, শান্তি ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক। তিনি যুদ্ধজয়ের পরই যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করে শান্তি ও মৈত্রীর নীতি গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। রাজার উপযুক্ত জ্ঞান ও সন্ন্যাসীর উপযুক্ত সাধুতা তাঁর মধ্যে ছিল। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেও তিনি ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। সকল ধর্মকেই তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন এবং সমস্ত মানবজাতির পার্থিব ও পরমার্থিব মঙ্গলসাধন করাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। ভারতের বাইরে বৈদেশিক দেশগুলিতেও তিনি জনসাধারণের পার্থিব ও পরমার্থিব কল্যাণসাধনের জন্য যা করেছিলেন, তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একান্তই বিরল। তিনি মনে করলে ভারতের বাইরেও সাম্রাজ্যবিস্তার করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি মানবপ্রেম, সর্বভূতে দয়া ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে গ্রহণ করেন। আদর্শ ও কার্যের এই অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য অশোকের চরিত্রকে একটি বেশিষ্ট্য দান করেছে।

অশোকের চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুশাসক হিসেবেও অশোক পৃথিবীর রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছেন। অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে তিনি দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমর্থ

হয়েছিলেন। পেশোয়ার থেকে বাংলাদেশ এবং কাশ্মীর থেকে মহীশূর পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই বিশাল সাম্রাজ্যে এক ভাষা ও এক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতের কোন সম্রাট এধরনের কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন না। সাংস্কৃতিক সংহতি ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য তাঁর রাজত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শাসক হিসেবে

ভাষা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রেও অশোকের অবদান স্মরণীয়। হস্তলিপির প্রচলন তাঁর রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়েছিল। খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লেখার প্রচলন তাঁর রাজত্বকালেই আরম্ভ হয়েছিল। অশোকের ধর্মপ্রচারের ফলেই পালি 'সর্বভারতীয় ভাষায়' উন্নীত হয়। এমন কি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিও পালি ভাষায় লেখার প্রচলন অশোকের আমলেই শুরু হয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ব্যাপক প্রচলনও অশোকের আমলেই শুরু হয়। রাজ্যের সর্বত্র বহু স্তূপ, চৈত ও স্তম্ভ নির্মাণ করে তিনি স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁর শিলালিপি ও অনুশাসনলিপি সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগরণের সৃষ্টি করে এবং জনসাধারণের মনে অনুপ্রেরণা যোগায়।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উন্নয়ন

রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে অশোকের অবদান স্মরণ করেই ওয়েলস্ (এইচ. জি.) মন্তব্য করে বলেছেন যে, "ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হাজার হাজার নৃপতিদের মধ্যে অশোকই একমাত্র উজ্জ্বল তারকা।" ডক্টর মজুমদারের মতে, "বিশ্বের ইতিহাসে অশোক অতুলনীয় এবং অশোকের আবির্ভাব ভারতকে মহিমান্বিত করেছে।" স্মিথের মতে, "অশোক মানবজাতির প্রথম ধর্মগুরু।"

ওয়েলসের মন্তব্য, মজুমদারের মন্তব্য, স্মিথের মন্তব্য

অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঃ যদিও অশোক তাঁর উৎকীর্ণ লিপি (inscription)-গুলিতে নিজেকে মগধের রাজা বলে অভিহিত করেছেন, তথাপি বাস্তবে তাঁর সাম্রাজ্য ছিল সুবিস্তৃত। অবশ্য কলিঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন রাজ্য তিনি যুদ্ধ করে জয় করেন নি। অশোকের শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান, কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী' ও হিউয়েন সাং-এর বিবরণী থেকে অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়।

তথ্যাদি

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে পুরী ও গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত ধাউলি ও জাওগদায় প্রাপ্ত অশোকের চতুর্দশ শিলালিপি (Fourteenth Rock Edicts) থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত সম্পর্কে ধারণা করা যায়। উত্তরে নেপালের তরাই অঞ্চলে রুমিনদেই স্তম্ভলিপি থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তর-সীমান্ত সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত নিগলিভা স্তম্ভলিপি (Nigliva Pillar Inscriptions) থেকে জানা যায় যে, বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তিনি এই অঞ্চলে তীর্থযাত্রী রূপে আগমন করেছিলেন। দেরাদুন জেলার অন্তর্গত কালসী নামক স্থানে প্রাপ্ত চতুর্দশ শিলালিপির এক অনুলিপি থেকে জানা যায় যে, হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত অশোকের সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পূর্ব-আফগানিস্থান ও তক্ষশীলায় অশোকের চতুর্দশ শিলালিপির অনুলিপি থেকে এই অঞ্চলে তাঁর সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পশ্চিম-ভারতে জুনাগড়ে প্রাপ্ত এক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই দিকে আরবসাগর পর্যন্ত অশোকের সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত ছিল। এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের থানা জেলায় প্রাপ্ত এক শিলালিপির উল্লেখ করা যায়। মহীশূরের অন্তর্গত চিতলদ্রুগ জেলায় প্রাপ্ত গৌণ শিলালিপি (Minor Rock Edict) থেকে উত্তর-মহীশূর পর্যন্ত অশোকের সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের কথা জানা যায়।

অশোকের উৎকীর্ণ লিপির প্রাপ্তিস্থান

অশোকের উৎকীর্ণ লিপির বিষয়বস্তু থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ শিলালিপিতে অশোকের সাম্রাজ্যের সংলগ্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে, যথা—'যবন', 'কম্বোজ', 'গান্ধার', 'রাষ্ট্রীক', 'ভোজ', 'অন্ধ্র' ইত্যাদি। 'যবন' বলতে সম্ভবত গ্রীকদের বোঝায় এবং এরা ছিল কাবুল ও সিন্ধুনদের মাঝামাঝি অঞ্চলের অধিবাসী। 'কম্বোজ'রা ছিল কাশ্মীরের সংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসী; 'গান্ধার'রা ছিল তক্ষশীলার অধিবাসী। 'রাষ্ট্রীক'রা ছিল মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। বেরার অঞ্চল ছিল 'ভোজ'দের বাসভূমি। র‍্যাপসন (Rapson)-এর মতে এই জনগোষ্ঠীগুলি অশোকের সরাসরি প্রজা ছিল না, কিন্তু তাঁর প্রভাবাধীন ছিল। অপরদিকে, ভাণ্ডারকার (Bhandarker)-এর মতে এরা ছিল অশোকের প্রজা। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে এই উপজাতিগুলি অশোকের প্রজা ছিল বটে, কিন্তু এরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করত।

উৎকীর্ণ লিপির সাক্ষ্য-প্রমাণ

দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ শিলালিপিতে দক্ষিণ-ভারতের চোল, পাণ্ড্য, কেরলপুত্র, ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোরের উল্লেখ আছে। মাদুরা, তিনেভেলী ও দক্ষিণ-ত্রিবাঙ্কুর ছিল প্রধানত পাণ্ড্যদের বাসভূমি। কেরলপুত্রদের বসবাস ছিল দক্ষিণ-কানাড়া, কুর্গ, মালাবার ও উত্তর-ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অশোকের সাম্রাজ্য সিরিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় এন্টিয়োকসের রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে তাঁর উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লেখ আছে।

শিলালিপি ও উৎকীর্ণ লিপি ছাড়াও অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কার্টিয়াস (Curtius)-এর রচনা থেকে নন্দ সাম্রাজ্যে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির কথা জানা যায়। হিউয়েন সাং-এর বিবরণীতে মগধ সাম্রাজ্যে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির উল্লেখ আছে। তিব্বতী গ্রন্থকার তারানাথের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, নেপাল অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং নেপালের ললিতাপত্তন নগরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অশোক। "রাজতরঙ্গিণী" অনুসারে কাশ্মীর অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সুতরাং এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকেই বলা যায় যে, অশোকের সাম্রাজ্য ছিল সুবিস্তৃত। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, পেশোয়ার থেকে বাংলাদেশ এবং কাশ্মীর থেকে মহীশূর পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অশোকের শাসন অপ্রতিহত ছিল, যা প্রাচীন ভারতে কখনও দেখা যায় নি।

মৌর্য শাসনের প্রকৃতি ঃ মেগাস্থিনিসের বিবরণ, 'অর্থশাস্ত্র' ও অশোকের অনুশাসনলিপি থেকে মৌর্য শাসন-প্রণালী সম্পর্কে যা জানা যায় তা থেকে মনে হয় যে, শাসনব্যবস্থা ছিল সুপরিকল্পিত। শাসনব্যবস্থার শৃঙ্খলা, কর্মচারীদের নিপুণতা, তাদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য ক্ষমতাভেদ এবং বিভিন্ন বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনা ঐতিহাসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। স্মিথের মতে মৌর্য শাসনব্যবস্থা আকবরের শাসনব্যবস্থা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ছিল। বস্তুত মৌর্য শাসনাধীনেই ভারতে জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল।

উন্নত শাসনব্যবস্থা

কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতে মৌর্য রাজারা ছিলেন 'স্বৈরাচারী'। চন্দ্রগুপ্তের শাসন-প্রণালীর বর্ণনা প্রসঙ্গে স্মিথ মন্তব্য করেছেন যে, "The normal Government of an Indian Kingdom appears to have been always untempered autocracy"। রোমান ঐতিহাসিক জাস্টিনও এই মত পোষণ করেন। এঁদের মতে মৌর্য শাসন-পদ্ধতি নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইরূপ মন্তব্যের পশ্চাতে তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, প্রথমত, রাজা ছিলেন একাধারে প্রধান বিচারক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান পুরোহিত ও প্রধান আইন-প্রণেতা। বাস্তবক্ষেত্রে রাজা কারও কাছে দায়বদ্ধ নন। দ্বিতীয়ত, সুনিয়ন্ত্রিত গুপ্তচর-প্রথা সম্ভবত জনসাধারণের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তৃতীয়ত, মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্যের বর্ণনা থেকে

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতে মৌর্য শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী ঃ যুক্তি

জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের সময় দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল, সামান্য অপরাধের জন্য গুরুদণ্ড দেওয়া হত। অনেক ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির সাহায্যে রাজস্ব পর্যন্ত আদায় করা হত। এই সকল তথ্যের ওপর নির্ভর করে স্মিথ মৌর্য শাসনকে "প্রাচ্যদেশসুলভ স্বৈরতন্ত্রের নামান্তরমাত্র" বলে অভিহিত করেছেন। চতুর্থত, মন্ত্রিদের সহায়তায় মৌর্যরাজারা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন বটে, কিন্তু মন্ত্রিদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসন পরিচালনার বাধ্যবাধকতা মৌর্য-রাজাদের ছিল না এবং বিদ্রোহ ব্যতীত রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করবার আর কোন উপায়ও ছিল না।

স্মিথ প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে

কিন্তু মৌর্য শাসন সম্পর্কে উল্লিখিত মতবাদ অতিরঞ্জিত ও ভ্রমাত্মক বলে অনেকে মনে করেন। রাজা সকল ক্ষমতার আধার ছিলেন সত্য এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই শাসনচক্র আবর্তিত হত। রাজকর্মচারী নিয়োগ, বিচারকার্য পরিচালনা, যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা, গুপ্তচর নিয়োগ, প্রজাপালন প্রভৃতি বিবিধ দায়িত্বভার রাজার ওপরেই ন্যস্ত থাকত। কিন্তু এসত্ত্বেও মৌর্য শাসনপদ্ধতি 'অবিমিশ্র-স্বৈরতন্ত্রের' ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এমন কথা বলা যায় না।

প্রথমত, রোমিলা থাপার-এর মতে সমকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা ও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই মৌর্যযুগে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীভূত প্রশাসন গড়ে উঠেছিল। মৌর্য শাসনব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ ছিলেন রাজা যিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অশোক রাজার এই ক্ষমতাকে পিতৃমূলক স্বৈরতন্ত্র (Paternal despotism) বলে অভিহিত করেছেন। "প্রজামাত্রই আমার সন্তান"—অশোকের এই ঘোষণা রাজ-কর্তব্যের আদর্শের ইঙ্গিত বহন করে। প্রজাবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবার উদ্দেশ্যে অশোক সাম্রাজ্যের সর্বত্র নিয়ত পরিভ্রমণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে রাজার ক্ষমতা সীমাহীন ছিল না। তাঁকে প্রচলিত রীতিনীতি ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসারে রাজ্যশাসন করতে হত। শৃঙ্খলার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তাঁকে বিভিন্ন বিভাগের রাজকর্মচারী ও মন্ত্রী নিয়োগ করতে হত। জনস্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য কর্মচারীদের প্রতি রাজার নির্দেশ থাকত। অশোকের কলিঙ্গলিপি এইস্থলে উল্লেখযোগ্য। রাজা মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করতেন এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে। মন্ত্রিপরিষদদের পরামর্শ গ্রহণ করার আইনত কোন বাধ্যবাধকতা রাজার ছিল না বটে, তবে সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত তিনি অগ্রাহ্য করতেন না। জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা ও উপজাতিদের স্বাতন্ত্র্য মৌর্য-রাজারা স্বীকার করতেন। এ ছাড়া মৌর্যযুগে অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং মৌর্যশাসনে একক অধিনায়কত্বের সঙ্গে স্বায়ত্তশাসনের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইওরোপের একাধিক রাষ্ট্রে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল এবং নৃপতিরা দৈবস্বত্বের ওপর তাঁদের রাজ্যশাসন ক্ষমতা (Divine Right of Kings) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু মৌর্য-রাজারা এইরূপ দাবি কখনও করেন নি। অশোকের মত পরাক্রমশালী সম্রাটও নিজেকে 'দেবানাম প্রিয়' বলে অভিহিত করেছেন।

রাজার ক্ষমতা সীমাহীন ছিল না

দ্বিতীয়ত, মৌর্য সম্রাটগণ কর্তৃক গুপ্তচর নিয়োগের সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, বৈদিক ও মহাকাব্যের যুগেও গুপ্তচর নিয়োগের প্রথা প্রচলিত ছিল। বস্তুত ভারতে গুপ্তচরদের সর্বদাই রাজার চক্ষু ও কর্ণ স্বরূপ বলে বিবেচনা করা হত ("In fact in India spies are always looked upon as the eyes and ears of the king")। বৈদিক যুগে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করার যন্ত্র-হিসেবে গুপ্তচর-প্রথার ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয়েছিল। সুতরাং মৌর্যযুগের পূর্বেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। 'অর্থশাস্ত্রে' গুপ্তচর নিয়োগের নির্দেশ আছে এবং সাধুসন্ন্যাসী, বিদ্যার্থী, বণিক্, সাধারণ-গৃহী প্রভৃতির ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে সকল শ্রেণীর মানুষের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার কথা উল্লিখিত আছে। গুপ্তচর নিয়োগ-সংক্রান্ত নীতি কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত করলেও তা প্রয়োগ করার দায়িত্ব স্থানীয় কর্মচারীদের হাতে

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অপরিহার্য যন্ত্র হিসেবে গুপ্তচর-প্রথার প্রচলন

ন্যস্ত থাকত। অশোক গুপ্তচর নিয়োগের উল্লেখ করেছেন যারা প্রজাবর্গের মনোভাব সম্পর্কে সম্রাটকে অবহিত রাখত। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হত। প্রকৃতপক্ষে এই প্রথার মাধ্যমেই মৌর্য-রাজারা প্রজাবর্গের অবস্থা ও রাজকর্মচারীদের কার্যাদি সম্পর্কে সংবাদ গ্রহণ করতেন।

তৃতীয়ত, চন্দ্রগুপ্তের সময় কর-প্রথা কঠোর ছিল সত্য। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, বিশাল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও সুশাসনের জন্য বিরাট সেনাবাহিনীরও প্রয়োজন ছিল। এই সেনাবাহিনীর ব্যয়-নির্বাহের জন্য কর-নীতি কঠোর করা ছাড়া সেযুগে অন্য কোন উপায় ছিল না। এছাড়া জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্যও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাই অস্বীকার করা যায় না যে, জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য মৌর্য-রাজারা স্বদেশে ও বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও জনকল্যাণমূলক কার্যাদি

চতুর্থত, মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক শক্তির মূলে ছিল কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত। রাষ্ট্রীয়-ঐক্য ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে বিভিন্ন শিল্প-সঙ্ঘ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। সুদক্ষ শাসনব্যবস্থার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য সুগঠিত হয় এবং হস্তশিল্প ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-সংস্থায় রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্র সরাসরি শিল্পীদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-সংস্থায় নিয়োগ করে শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করত এবং এই শিল্পীরা রাষ্ট্রীয় কর থেকে মুক্ত ছিল। অন্যান্য শিল্পীরা ব্যক্তিগতভাবে অথবা শিল্প-সঙ্ঘে যোগদান করে নিজেদের জীবিকা অর্জন করত। শিল্প-সঙ্ঘগুলি রাষ্ট্রীয় কর আদায় ও শিল্প-সংস্থাগুলি পরিচালনা করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করত। মৌর্য শাসনের এ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ

পঞ্চমত, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও মৌর্যরাজারা কখনও রাষ্ট্রশক্তিকে নিজেদের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন নি, যা মধ্যযুগে ইওরোপীয় নৃপতিদের মধ্যে দেখা যায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ও 'প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে' রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে কঠোর নির্দেশ দেওয়া আছে। রাষ্ট্র ও প্রজাবর্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করাই রাজার প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। রাজ-কর্তব্য সম্বন্ধে অশোকের ধারণা পৃথিবীর ইতিহাসে নিতান্তই বিরল। "প্রজামাত্রই আমার সন্তানতুল্য, পিতা যেমন পুত্রের সুখে সুখী হন, আমিও প্রজাবর্গের মঙ্গলে সেইরূপ সুখী হই"। রাজ-কর্তব্য সম্বন্ধে অশোকের এইরূপ ধারণা মৌর্যশাসনের প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রাজকর্তব্য সম্বন্ধে উন্নত ধারণা

এই সকল দিক থেকে বিচার করলে মৌর্য শাসনব্যবস্থাকে কোনমতেই 'সীমাহীন-স্বৈরতন্ত্র' বলা যায় না।

অশোকের উত্তরাধিকারীগণ ঃ আনুমানিক ২৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট অশোক পরলোক গমন করেন। তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে অশোক তক্ষশীলায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই সঠিকভাবে জানা যায় না। অশোকের যে বহু সন্তান-সন্ততি ছিল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু যথার্থ এদের মধ্যে কে অশোকের পরেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। অশোকের শিলালিপিতে তীবরের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তীবর কোনও সময় সিংহাসনে আরোহণ করেন নি। সমসাময়িক সাহিত্যে মহেন্দ্র, জলৌকি ও কুনালের নাম পাওয়া যায়। কোথাও মহেন্দ্রকে অশোকের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোথাও তাঁকে তাঁর ভ্রাতা বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর কোন্‌টি সত্য তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়

অশোকের উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে মতভেদ

'বিষ্ণুপুরাণ'* অনুসারে অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুনাল মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি ৮ বছর রাজত্ব করেন। কুনালের পর বন্ধুপালিত, ইন্দ্রপালিত, দেববর্মণ ও বৃহদ্রথ যথাক্রমে রাজত্ব করেন। কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী' অনুসারে অশোকের পুত্র জলৌকি কাশ্মীর রাজ্যের কর্তৃত্বলাভ করেন। তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের মতে গান্ধার-রাজ্যে অশোকের উত্তরাধিকারী ছিলেন বীরসেন। বৌদ্ধগ্রন্থ 'দিব্যবদনে' অশোকের উত্তরাধিকারীদের নিম্নোক্ত তালিকা পাওয়া যায়, যেমন—সম্প্রতি, বৃহস্পতি, পুষ্যধর্মণ ও পুষ্যমিত্র। এইরূপ পরস্পর-বিরোধী তথ্যের ওপর নির্ভর করে অশোকের পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের সময়ানুক্রম স্থির করা অসম্ভব।

'গার্গী-সংহিতা' অনুসারে অশোকের পৌত্র দশরথ মৌর্য সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। দশরথের পর 'সম্প্রতি' সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'পাটলিপুত্রকল্প'-নামক গ্রন্থে সম্প্রতিকে 'ভারত-অধীশ্বর' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্মিথের মতে সম্প্রতি অবন্তি ও পশ্চিম-ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। জৈন গ্রন্থে সম্প্রতিকে পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বলা হয়েছে। 'বিষ্ণুপুরাণ', 'বায়ুপুরাণ' ও 'গার্গী-সংহিতায়' সালিশুক নামে অশোকের অপর এক উত্তরাধিকারীর নাম পাওয়া যায়। ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে সম্প্রতির পুত্র বৃহস্পতি ও সালিশুক ছিলেন অভিন্ন।

মৌর্যবংশের অবসান

পুরাণ ও বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' অনুসারে বৃহদ্রথ ছিলেন মৌর্যবংশের শেষ রাজা। তিনি ১৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিজ সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক নিহত হন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ঃ চন্দ্রগুপ্ত ও কৌটিল্যের চেষ্টায় যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অশোকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের এই পতন কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বিভিন্ন কারণে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

(১) ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ঃ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে অশোকের প্রতি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। শাস্ত্রীর মতে এই বিদ্বেষের কারণ ছিল—অশোক কর্তৃক পশুবলির নিষিদ্ধকরণ; 'দণ্ড-সমতা' ও 'ব্যবহার-সমতা' নীতির প্রবর্তন এবং 'ধর্মমহামাত্র' নিয়োগ। শাস্ত্রী মনে করেন যে, পশুবলি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা একমাত্র ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়েছিল। 'দণ্ড-সমতা' ও 'ব্যবহার-সমতা' নীতির প্রবর্তন করে অশোক ব্রাহ্মণদের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। 'ধর্মমহাপাত্র' নিযুক্ত করে অশোক ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্মণরা পুষ্যমিত্র শুঙ্গের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে মৌর্য বংশের বিলোপ-সাধনে সহায়তা করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত

কিন্তু ডক্টর রায়চৌধুরী, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা শাস্ত্রী-মহাশয়ের অভিমতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রথমত, অহিংসা-নীতি অনুসরণ করেই অশোক প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং এই নিষেধ কোন শ্রেণীবিশেষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় নি। এ ছাড়া বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্রাহ্মণরাও প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। 'শ্রুতি'-সাহিত্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, 'দণ্ড-সমতা' ও 'ব্যবহার-সমতা' নীতি প্রয়োগ করে তিনি

ডক্টর রায়চৌধুরী ও মজুমদারের মত

---

* *'বিষ্ণুপুরাণ' অনুসারে অশোকের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন—সুরদাস, দশরথ, সংগত, সালিশুক, শতধানবন ও বৃহদ্রথ। 'মৎস্যপুরাণ' অনুসারে অশোকের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন—দশরথ, সম্প্রতি, শতধানবন ও বৃহদ্রথ।*

সাম্রাজ্যের সর্বত্র শ্রেণী নির্বিশেষে একই পদ্ধতির বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে তৎপর হন। এর দ্বারা ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকারে হস্তক্ষেপ করার কোন চেষ্টা হয় নি। তৃতীয়ত, 'ধর্মমহামাত্র'রা যে কেবলমাত্র ধর্মপ্রচার করতেন এমন কথা বলা যায় না। ধর্মপ্রচার করা ছাড়াও 'ধর্মমহামাত্র'রা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। অধিকন্তু 'ধর্মমহামাত্র'রা যে কেবলমাত্র অব্রাহ্মণদের ভিতর থেকেই নিয়োগ করা হত এরূপ কোন প্রমাণ নেই। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অশোক ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু এবং ধর্ম সম্বন্ধে উদারতা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণদের তিনি শ্রমণদের মতই শ্রদ্ধা করতেন ও অর্থদান করতেন। সুতরাং অশোকের প্রতি ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না।

(২) সাম্রাজ্যের বিশালতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতা : মৌর্য সাম্রাজ্যের বিশালতা পতনের একটি কারণ বলে চিহ্নিত করা যায়। সেই যুগে দ্রুত গমনাগমন ব্যবস্থার অভাব ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের অসুবিধার ফলে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির পক্ষে সর্বত্র আধিপত্য রক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল সুগঠিত প্রশাসন ও প্রজাবর্গের রাজনৈতিক আনুগত্য। রাজনৈতিক দিক থেকে মৌর্য প্রশাসন সুগঠিত হওয়া সত্ত্বেও এর কতকগুলি মারাত্মক দুর্বলতাও ছিল যা সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। আমলাতন্ত্র ছিল অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ও রাজা ছিলেন এর মধ্যমণি এবং সকলের আনুগত্য ছিল একমাত্র রাজার প্রতি। রাজার পরিবর্তন ঘটলে আমলাদেরও আনুগত্যের পরিবর্তন ঘটত ও এমন কি সেই সঙ্গে আমলাদেরও রদ-বদল হত যা প্রশাসনের সংহতি বিনষ্ট করত। এছাড়া আমলারা নিজেদের খোয়াল-খুশি অনুসারে অধস্তন কর্মচারী নিয়োগ করতেন এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত ও দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হত না। একই আঞ্চলিক সামাজিক গোষ্ঠী থেকে কর্মচারী নিয়োগ করার ফলে আঞ্চলিক প্রশাসন বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক গোষ্ঠীর দখলে চলে যেত। সামাজিক ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য নিয়ন্ত্রণ করার কোন সুনির্দিষ্ট রীতি-নীতি না থাকায় গোষ্ঠীগত প্রশাসন সাম্রাজ্যের সামাজিক প্রশাসন পঙ্গু করে ফেলে। এছাড়া গুপ্তচর-প্রথা সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা ধরনের অশান্তি ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। রোমিলা থাপারের (R. Thapar) ভাষায়, "The system used by the Mauryas, espionage must have created manifold tensions in both political and administrative activity")।

(৩) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচার : আলোচ্য সময়ে রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করত রাজা বা সম্রাটের ব্যক্তিত্বের ওপর। অশোক শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজকর্মচারীদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করায় প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক শাসকরা জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করতেন। অশোকের শিলালিপিতে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর পর এই অত্যাচার চরমে পৌঁছায়। ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী প্রাদেশিক শাসকরা সাম্রাজ্যের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

(৪) স্বতন্ত্র জাতিগুলির বিদ্রোহ : নীতিগতভাবে অশোক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বতন্ত্র জাতি ও উপজাতিগুলির স্বাতন্ত্র্য ও সমতা স্বীকার করেছিলেন। মৌর্যশাসনভুক্ত করার পরিবর্তে অশোক এদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেন। এই স্বায়ত্তশাসিত জাতিগুলির মধ্যে ছিল অন্ধ্র, পুলিন্দ, কম্বোজ, রাষ্ট্রীক, ভোজ, চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র। অশোকের মৃত্যুর পর এরা শক্তিশালী হয়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনে সাহায্য করে।

(৫) পরবর্তী সম্রাটদের অযোগ্যতা ঃ সাম্রাজ্যের দুর্দিনে শাসনভার পরিচালনা বা ভাঙ্গন রোধ করে তা রক্ষা করবার মত শক্তি ও যোগ্যতা অশোকের পরবর্তী রাজাদের ছিল না। কলহণের 'রাজতরঙ্গিণী' থেকে জানা যায়, অশোকের মৃত্যুর পর জলৌকি কাশ্মীরে স্বাধীনতা ঘোষণা করে কনৌজ পর্যন্ত নিজ রাজ্যবিস্তার করেন। তারানাথের গ্রন্থ অনুসারে বীরসেন গান্ধারে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুতরাং অশোকের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। ডক্টর রায়চৌধুরীর মতে, "His (Asoka's) sceptre was the bow of Ulysses which could not be drawn by any weaker hand"।

(৬) অর্থনৈতিক অবনতি ঃ অর্থনৈতিক অবনতি মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অপর অন্যতম মুখ্য কারণ বলে অনেকে অনুমান করেন। এক বিশাল সামরিক বাহিনীর ভরণ-পোষণ, এক বিশাল সংখ্যক কর্মচারীদের বেতন দান এবং নতুন নতুন অঞ্চলে বসতিস্থাপন প্রভৃতি রাজকোষের ওপর এক বিরাট চাপের সৃষ্টি করে। যদিও মৌর্য নগরগুলির ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রথম দিকে মৌর্য অর্থনীতির সম্প্রসারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তথাপি পরবর্তী কালের মুদ্রার অবনতি এক ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। অশোকের পরবর্তী মৌর্য সম্রাটদের আমলে প্রচলিত মুদ্রায় রৌপ্যের ভাগ নিতান্তই সামান্য থাকায় তা অর্থনৈতিক সংকটের আভাস বলে অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকের মতে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত রাজস্বের অভাব মৌর্য-মুদ্রায় প্রতিফলিত দেখা যায়। অবশ্য একমাত্র মুদ্রার অবনতি থেকেই সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর মূলে অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণও ছিল। যদিও সমগ্র উপত্যকায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রাধান্য ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অর্থনীতি ও রাজস্বের প্রকার ভেদও ছিল যথেষ্ট। এর ফলে অর্থনীতির স্থিতাবস্থা (equilibrium) দারুণ ভাবে বিঘ্নিত হয় এবং পর্যাপ্ত ভূমি-রাজস্বের অভাব রাজকোষের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে যার ফলে সাম্রাজ্যের সুস্থিরতা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।*

(৭) অশোকের দায়িত্ব ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোকের দায়িত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কলিঙ্গ-যুদ্ধের পর অশোক তাঁর পূর্বসূরীদের দিগ্বিজয়-নীতি ত্যাগ করে ধর্মবিজয় নীতি গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রতিও 'ভেরীঘোষের' পরিবর্তে 'ধর্মঘোষ' নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। অহিংস-নীতিকে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে গ্রহণ করার ফলে রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। সামরিক শক্তির অবক্ষয় হেতু অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় এবং ব্যাক্ট্রীয়-গ্রীকদের ক্রমাগত আক্রমণ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য করে তোলে। অবশেষে বিদেশী আক্রমণের সুযোগ নিয়ে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে মৌর্যবংশের অবসান ঘটান।

এক প্রাচীন আধ্যাত্মিক দেশ ভারতকে নৈতিক গুণসম্পন্ন দেশে পরিণত করার চেষ্টা করে অশোক প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করেন। ডক্টর ভাণ্ডারকর-এর মতে অশোকের এই নৈতিকতাবোধের ফলে সামরিকবাদ, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও বৈষয়িক উন্নয়নের প্রতি মানুষের মনে এক প্রবল অনীহা দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতি হল মৌর্য সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙ্গন। " The effects of this change of policy, of the replacement of vijaya to Dhamma-vijaya. Were politically disastrous, though spirituelly glorious" —ভাণ্ডারকর, Asoka,পৃষ্ঠা ২২৪। ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে যে সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্যাক্ট্রীয়-গ্রীকদের আক্রমণের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল সেই সময় ভারতে প্রয়োজন ছিল পুরুরাজ অথবা চন্দ্রগুপ্ত

---

* *রোমিলা থাপার—উল্লিখিত গ্রন্থ—পৃঃ—৮৯।*

মৌর্যের মত সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী এক সম্রাটের। কিন্তু সেই সময় ভারতে ছিলেন এক আদর্শবাদী ও শান্তিপ্রিয় সম্রাট। রাজনৈতিক দিক থেকে এর ফল মারাত্মক হয়।* অবশ্য এই মতের বিরোধিতা করে নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বলেছেন যে, যুদ্ধ করলেই রাষ্ট্র শক্তিশালী হয় না। ঔরঙ্গজেব জীবনব্যাপী সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন কিন্তু তিনি এর মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্যকে দৃঢ়তর করতে পারেন নি।

তত্ত্বগতভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোককে দায়ী করা হলেও তাঁর অহিংসা বা ধর্মবিজয় আদর্শই যে এই সাম্রাজ্যের পতনের কারণ এমন কথা বলা যায় না। এন. শাস্ত্রী মনে করেন যে, অশোকের শান্তিবাদী ও যুদ্ধ-বিমুখ নীতি এক নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। এমন কোন প্রমাণ নেই যে তিনি সমরবাহিনীকে শক্তিহীন করেছিলেন অথবা সীমান্তে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করেছিলেন। সুতরাং তাত্ত্বিক বিচারে

উপসংহার

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোকের রাষ্ট্র-পরিচালন নীতিকে দায়ী করা হলেও, এর পতনের জন্য অন্যান্য কারণও ছিল যার জন্য কোন এক বিশেষ রাজাকে দায়ী করা চলে না। অশোকের ধর্মবিজয় নীতি আংশিকভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হলেও, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি পিতামহের দিগ্বিজয় নীতি অনুসরণ করে চললেও কোন না কোন সময় এই সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যই ঘটত। কিন্তু সভ্যজগতে তিনি ভারতের যে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন দু' হাজার বছর পরেও আজও অম্লান।

মৌর্যযুগে ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক ঃ মৌর্যদের আমলে বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল। এইযুগে দক্ষিণ ও পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপিত হয়। অবশ্য পূর্ব-সীমান্তের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ তেমন ছিল না।

সেলিউকসের অভিযানের সময় গ্রীকজগতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল শত্রুতামূলক। কিন্তু এর পর থেকে (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৫) গ্রীক শাসকদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য একাধিক অভিযান চালিয়ে ভারতে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটান। কথিত আছে যে, সেলিউকস পরাজিত হয়ে চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। ভারত-সীমান্তের বাইরে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলার নীতি গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৫ অব্দের পর থেকে চন্দ্রগুপ্ত সিরিয়ার গ্রীকদের সঙ্গে সদ্ভাব-রক্ষা করেন এবং সিরিয়ার অধিপতি সেলিউকাসের দূত মেগাস্থিনিস কিছুদিন চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের দরবারে অবস্থান করেন। গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাসের মতে চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য গ্রীকদের খুবই পছন্দ করতেন এবং বহু গ্রীক তাঁর রাজধানীতে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, রাজধানী পাটলিপুত্রে যে পুরসংস্থা ছিল তার অন্যতম দায়িত্ব ছিল বিদেশীদের তত্ত্বাবধান করা।

চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী বিন্দুসারও গ্রীকদের সঙ্গে শান্তি ও মৈত্রীর নীতি অব্যাহত রাখেন। সিরিয়ার পরবর্তী অধিপতি অ্যান্টিয়োকাস ডাইমেকস্ নামে এক গ্রীককে রাষ্ট্রদূত রূপে মৌর্য দরবারে পাঠান। মিশরের গ্রীক অধিপতি টলেমী ডায়নেসাস নামে এক গ্রীককে রাষ্ট্রদূত রূপে মৌর্য দরবারে পাঠিয়েছিলেন। গ্রীক নৃপতিদের সৌজন্যের বিনিময়ে বিন্দুসারও সিরিয়া ও মিশরে রাষ্ট্রদূত পাঠান।

---

* *"Dark clouds were looming in the North-Western horizon. India needed (at that time) men of the calibre of Poros and Chandragupta Maurja. She got a dreamer. The result was politically disastrous"—H.C. Roychowdhury—Political history of ancient India.*

পরবর্তী মৌর্য সম্রাট অশোকও বহির্জগতে শান্তি ও মৈত্রীর নীতি অনুসরণ করেন। তিনি পিতা ও পিতামহের মত গ্রীক নৃপতিদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও বিন্দুসারের নীতির অনুকরণে অশোক গ্রীক রাজ্যগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময় করেন। মৌর্য প্রশাসনে গ্রীক কর্মচারী নিযুক্ত করতেও অশোক দ্বিধা করেন নি। এই প্রসঙ্গে তুসাস্পা নামে এক গ্রীককে সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ উল্লেখ করা যায়। অশোকের এয়োদশ শিলালিপিতে উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তবর্তী রাজ্যের রাজা এ্যান্টিয়োকাসের কথা বলা হয়েছে। এই এ্যান্টিয়োকাস ছিলেন সিরিয়ার রাজা। সেই সঙ্গে এই শিলালিপিতে মিশরের রাজা দ্বিতীয় টলেমি, ম্যাসিডনের রাজা এন্টিগোনাস, এপিরাসের রাজা আলেকজাণ্ডার প্রমুখ রাজার উল্লেখ আছে। এই সকল গ্রীক রাজাদের সঙ্গে অশোক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। এই যোগাযোগের ফলে গ্রীক জগতে ভারতীয়দের জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসুক্যের সঞ্চার হয়। ধর্মবিজয়-নীতি গ্রহণ করার পর অশোক বহু ধর্মপ্রচারক গ্রীক-শাসিত দেশগুলিতে পাঠান। এয়োদশ শিলালিপি (Rock Edict XIII)-তে অশোক দাবি করেছেন যে, তাঁর ধর্মপ্রচারকরা সিরিয়া, মিশর, করিন্থ, ম্যাসিডন প্রভৃতি রাজ্যে গিয়ে ধর্মের বাণী প্রচার করেন এবং সাফল্য অর্জন করেন। অশোকের এই দাবি সর্বাংশে সত্য বলে মেনে নিতে অনেকের দ্বিধা আছে। একাদশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত আল্-বিরুনী তাঁর 'কিতাব-উল-হিন্দ' নামক গ্রন্থে খোরাসান, ইরাক, মসুল, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্মের নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন।

অশোকের সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত থাকা সত্ত্বেও সেখানে পারসিক সংস্কৃতির কিছু প্রচলন তখনও অব্যাহত ছিল। অনেকের মতে অশোকের পাটলিপুত্রের প্রাসাদ ও সারনাথ স্তম্ভের সিংহমূর্তি প্রভৃতিতে পারসিক ও গ্রীক শিল্পরীতি অনুসৃত হয়েছিল।

কিংবদন্তী অনুসারে কাশ্মীর মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং অশোক শ্রীনগর শহরের পত্তন করেন। অনেকের মতে মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত খোটান মৌর্যদের দখলে ছিল। তিব্বতীয় সূত্রে বলা হয়েছে যে, ভারতের ও চীনের রাজনৈতিক পলাতকদের যুগ্ম-চেষ্টায় খোটান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং অশোক এই রাজ্যে পরিভ্রমণে আসেন। এই বক্তব্য কতদূর সত্য তা বলা যায় না। সেইসময় চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। সম্ভবত আসাম ও ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের সামান্য যোগাযোগ ছিল। মৌর্যযুগে নেপালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অনেকের মতে নেপালের এক অভিজাতের সঙ্গে অশোকের কন্যার পরিণয় হয়।

মহীশূরে প্রাপ্ত অশোকের শিলালিপি থেকে ধারণা করা যায় যে, দক্ষিণ-ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ-ভারতের চোল, পাণ্ড্য, কেরলপুত্র প্রভৃতি রাজ্যগুলির সঙ্গে অশোক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

সিংহলের সঙ্গে মৌর্যদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সিংহলী গ্রন্থে মৌর্যদের সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। দূত হিসেবে অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্র বা মহিন্দকে সিংহলে পাঠান। দুই দেশের মধ্যে দূত ও উপঢৌকনের রীতিমত আদান-প্রদান হত। কথিত আছে, যে বটবৃক্ষের তলে বুদ্ধ পরমজ্ঞান লাভ করেন, সেই বৃক্ষের একটি শাখা সিংহলে প্রেরণ করা হয়, যা আজও বর্তমান বলে সিংহলীরা দাবি করে।